দৈনিক সংবাদ

079

তারিখ 18 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

কারিগরি শিক্ষা একটি বাস্তবধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থা। কিন্তু ১৯৮৪ এবং ১৯৮৫ সালের প্রকৌশল ডিপ্লোমা (পুরকৌশল) পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বাস্তবতার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তারই দু' একটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হল। গত ৯।৩।৮৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত আর, সি, সি-২ প্রশ্নপত্রে ৫ (খ) প্রশ্নে যে সমস্ত তথ্যাদির সাহায্যে ০'৮২ ফুট প্রস্থ ইটের দেয়ালের ফুটিং ডিজাইন করতে বলা হয়েছে, তাতে দেয়াল ফুটিং-এর সূত্রানুযায়ী প্রকৃত ডিজাইন সম্ভব নয়। কারণ, প্রদত্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে ডিজাইন করে দেখা গেছে যে, ফুটিং-এর প্রস্থ পাওয়া যায় ১০৮'৬৬ ফুট এবং পুরুত্ব পাওয়া যায় ১৫ ফুট কিংবা তারও বেশী। আর ১০ সুতি রড ব্যবহার করেও এক রড হতে অন্য রডের দূরত্ব হয় মাত্র ১'৫ ইঞ্চি। যেখানে একটি ইমারতের কক্ষের উচ্চতা সাধারণতঃ ১০ ফুট হয়ে থাকে সেখানে কিভাবে ফুটিং এর পুরুত্ব ১৫ ফুট হতে পারে এবং প্রস্থই বা ১০৮'৬৬ ফুট কিভাবে সম্ভব। যেখানে A.C.I code অনুযায়ী দেয়াল ফুটিং এ ৫ বা ৬ সুতি রড ব্যবহার করা হয় সেখানে ১০ সুতি রড ব্যবহার করা কি সম্ভব?

৪ (খ) প্রশ্নের প্রদত্ত রিটেইনিং দেয়ালটির ভিত্তির গভীরতা (০'২৬২৫ ০'১৬৪৫) এবং গ্রাউণ্ড লেভেল হতে উচ্চতা ১'৪৭৬, ষ্টেমের উপরের প্রস্থ ০'৮২ এবং নীচের প্রস্থ ০'৯৮৪। ভিত্তির প্রস্থ (০'৪৯২৫ ০'৯৮৪ ০'৬৫৫) রিটেইনীং দেয়াল নির্মাণ করা হয় কোন বাঁধের মাটি আটকানোর জন্য কিংবা জলাশয়ের পানি আটকানোর জন্য। কিন্তু প্রশ্নপত্রে যে মাপ দেয়া হয়েছে, বাস্তবে এ ধরনের কোন দেয়াল নির্মাণ করা সম্ভব নয়। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি পরীক্ষার (যেমন, সার্ভেয়িং-৩, ড্রয়িং-৩, এষ্টিমেটিং ৩) প্রশ্নপত্রে ভুল তথ্যাদি দেয়া হয়েছে। এভাবে ভুল প্রশ্নে বা অসামঞ্জস্য প্রশ্নে পরীক্ষা হলে পরীক্ষার্থীর ভাল ফলাফল তো দূরের কথা অনেক সময় ফেলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তবতা বহির্ভূত ও ভুল প্রশ্ন একজন পরীক্ষার্থীর জীবনে যে কতটুকু বিপর্যয় ডেকে আনে প্রশ্নকর্তা বা বোর্ড কর্তৃপক্ষ তা বিবেচনা করে দেখবেন কি? আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রশ্ন করা হবে না। ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহের ভুল প্রশ্নের যারা উত্তর দিয়েছে কিংবা দিতে চেষ্টা করেছে তাদেরকে নম্বর দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো: লুৎফুর রহমান
পুরকৌশল,
ময়মনসিংহ পলিটেকনিক
ইনষ্টিটিউট।

শিক্ষকের সামাজিক ভূমিকা প্রসঙ্গে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক মো: শামসুল হকের 'শিক্ষক ও শিক্ষকতা' শীর্ষক (৭ ও ৮ই মার্চের 'সংবাদ'-এ দু'পর্বে প্রকাশিত) নিবন্ধটি সুলিখিত ও সময়োপযোগী। নিবন্ধটিতে 'শিক্ষকের সামাজিক ভূমিকা' প্রসঙ্গটি অন্যান্য আলোচিত বিষয়গুলোর চেয়ে অনেকাংশে অনুজ্জ্বল। বিশেষ করে বর্তমানে আমাদের সমাজে যে সমস্ত জটিলতার খিচুড়িভবন ঘটেছে সে ব্যাপারে আমাদের সংগ্রামী শিক্ষকবৃন্দের ভূমিকা অনুল্লেখিত রয়ে গেছে। নিবন্ধের দু/একটি বিষয়ে বর্তমান পত্রলেখকের ব্যক্তিগত ভাবনার সবিনয় নিবেদন নিম্নরূপ।

প্রথমেই আবহমানকাল থেকে গ্রামে শিক্ষকগণ লোকের চিঠিপত্র লেখা ও পড়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে গ্রামীণ শিক্ষকদের যে অপ্রত্যক্ষ নিবিরোধী চরিত্রের আভাস মেলে তা বৃটিশ শাসিত বাংলার শিক্ষকগণের পালিত ভূমিকার তুলনায় ম্লান। সেকালে স্বরাজ-সাধনায় বাংলার শিক্ষকগণ ইংরেজের সরকারী চাকরি ও বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করে ও বিদেশী পণ্য বর্জন করে প্রত্যক্ষ সামাজিক ভূমিকা পালন করেছেন।

শিক্ষকগণ 'নানা বিষয়ে সরকার ও জনসাধারণকে পরামর্শ দিতে পারেন।' এখানে 'পরামর্শ' শব্দটি শিক্ষকের সামাজিক ভূমিকাকে এক ধরনের আরোপিত নিরপেক্ষতার অবগুন্ঠনে ঢেকে দিয়েছে। মনে রাখতে হবে 'স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ/বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনও শেখেনি বাঁচিতে।' (এবার ফিরাও মোরে/চিত্রা/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।) এবং গর্বের বিষয় বাঙালী তার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকসমাজকে ওই ভূমিকায় দেখতে অভ্যস্ত নয়। আমাদের সামগ্রিক সমাজ থেকে তাঁরা কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসী নন। ইতিহাস সে কথাই বলে। বায়ান্ন, একাত্তর এবং আজও শিক্ষকবৃন্দের সামাজিক ভূমিকা অত্যন্ত সরব, প্রত্যক্ষ ও বলিষ্ঠ। শিক্ষকগণ, ঝগড়া-বিবাদে মধ্যস্থতা, বিবাহ উৎসব, ধর্মোৎসব জাতীয়-সামাজিক কাজে গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন বলে নিবন্ধে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখিত কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব কিনা, বিশেষ করে আজকের নিরিখে এবং বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। সে কথাটি একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মত চোখের সামনে ঝুলছে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে পৃথিবীটাকে বাসযোগ্য করে যাবার দৃপ্ত অঙ্গীকার ছিল কবি কিশোর সুকান্তের, তবুও পৃথিবীটা আজ যতটা যুদ্ধযোগ্য ততটা বাসযোগ্য নয়। বিশ্ব কবির নান্দনিক নির্মাণে লক্ষ্মী সরস্বতীর মিলন হলেও অর্থের উন্মত্ত দাপটে অধীত বিদ্যার গৌরব আজ ভূলুণ্ঠিত। মূল্যবোধের সংকটে সমাজ উদভ্রান্ত। তথাকথিত অর্থকরী শিক্ষাব্যবস্থা কোনো স্বার্থশূন্য মহৎ আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। দুষ্টের পালন আর শিষ্টের দমন এখন প্রাত্যহিক। এইসব অমঙ্গল আর অসুন্দরের বাধাহীন প্রবাহে বিচলিত হওয়াটাই বোধকরি শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যায় তীর্থ প্রাঙ্গণ যে শিক্ষকের পদধূলিতে ধন্য।

শ্রদ্ধেয় অর্থনীতিবিদ-শিক্ষক ডঃ মুশাররফ হোসেন তার সাম্প্রতিকতম গ্রন্থে বলেছেন, "আমি মনে করি যে, আমার মত যারা খেয়ে পরে ভালই আছেন, কিন্তু যাদের সামাজিক বিবেকবোধ একেবারেই লোপ পায়নি তাদের সবারই উচিত দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাদের সুচিন্তিত মতামত সর্বসমক্ষে উপস্থিত করা।" (বাংলাদেশের সমাজ ও সামরিক শাসন, পৃষ্ঠা: ২৪)। আমাদের বিদ্যমান সামাজিক পরিস্থিতিতে শিক্ষকের সামাজিক ভূমিকাটা ওপরের উদ্ধৃতির মধ্যেই পাওয়া যায়। সমাজ ও যুগের দাবী সেটাই।

--রমেন বিশ্বাস
অর্থনীতি বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।